সূরা আল-আহযাব:৩য় রুকু (২১-২৭)আয়াত

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَ الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ ذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا ৩৩ : ২১

২১. অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ, তার জন্য যে আশা রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহকে বেশী স্মরণ করে।

যে প্রেক্ষাপটে এ আয়াতটি নাযিল হয়েছে সে দৃষ্টিতে বিচার করলে বলা যায়, যারা আহ্যাব যুদ্ধে সুবিধাবাদী ও পিঠ বাঁচানোর নীতি অবলম্বন করেছিল তাদেরকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যেই নবী করীমের ﷺ কর্মধারাকে এখানে আদর্শ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে, তোমরা ছিলে ঈমান, ইসলাম ও রসূলের আনুগত্যের দাবীদার। তোমাদের দেখা উচিত ছিল, তোমরা যে রাসূলের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছো তিনি এ অবস্থায় কোন্ ধরনের নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

যদি কোন দলের নেতা নিজেদের নিরাপদ থাকার নীতি অবলম্বন করেন, নিজেই আরাম প্রিয় হন, নিজেই ব্যক্তিগত স্বার্থ সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেন, বিপদের সময় নিজেই পালিয়ে যাবার প্রস্তুতি করতে থাকেন, তাহলে তার অনুসারীদের পক্ষ থেকে এ দুর্বলতাগুলোর প্রকাশ যুক্তিসঙ্গত হতে পারে। কিন্তু এখানে তো রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবস্থা এই ছিল যে, অন্যদের কাছে তিনি যে কষ্ট স্বীকার করার জন্য দাবী জানান তার প্রত্যেকটি কষ্ট স্বীকার করার ব্যাপারে তিনি সবার সাথে শরীক ছিলেন, সবার চেয়ে বেশী করে তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এমন কোন কষ্ট ছিল না যা অন্যরা বরদাশ্ত করেছিল কিন্তু তিনি করেননি।

খন্দক খননকারীদের দলে তিনি নিজে শামিল ছিলেন। ক্ষুধা ও অন্যান্য কষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মুসলমানের সাথে তিনি সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবরোধকালে তিনি সর্বক্ষণ যুদ্ধের ময়দানে হাজির ছিলেন এবং এক মুহূর্তের জন্যও শত্রুদের সামনে থেকে সরে যাননি।

বনী কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার পরে সমস্ত মুসলমানদের সন্তান ও পরিবারবর্গ যে বিপদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল তাঁর সন্তান ও পরিবারবর্গও সেই একই বিপদের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। তিনি নিজের সন্তান ও পরিবারবর্গের হেফাজতের জন্যও এমন কোন বিশেষ ব্যবস্থা করেননি যা অন্য মুসলমানের জন্য করেননি। যে মহান উদ্দেশ্যে তিনি মুসলমানদের কাছ থেকে ত্যাগ ও কুরবানীর দাবী করেছিলেন সে উদ্দেশ্যে সবার আগে এবং সবার চেয়ে বেশি করে তিনি নিজে নিজের সবকিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন। তাই যে কেউ তাঁর অনুসরণের দাবীদার ছিল তাকে এ আর্দশ দেখে তারই অনুসরণ করা উচিত ছিল।
পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী এ ছিল এ আয়াতের নির্গলিতার্থ। কিন্তু এর শব্দগুলো ব্যাপক অর্থবোধক এবং

এর উদ্দেশ্যকে কেবলমাত্র এ অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার কোন কারণ নেই। আল্লাহ এ কথা বলেননি যে, কেবলমাত্র এ দৃষ্টিতেই তাঁর রসূলের জীবন মুসলমানদের জন্য আর্দশ বরং শর্তহীন ও অবিমিশ্রভাবে তাঁকে আর্দশ গণ্য করেছেন। কাজেই এ আয়াতের দাবী হচ্ছে, মুসলমানরা সকল বিষয়েই তাঁর জীবনকে নিজেদের জন্য আর্দশ জীবন মনে করবে এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের চরিত্র ও জীবন গড়ে তুলবে।

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর; নিশ্চয় আল্লাহ্ শাস্তি দানে কঠোর। সূরা হাসরঃ ৭

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

বলুন, ‘তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অত্যান্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আলে ইমরানঃ ৩১

এই আয়াতে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, রসূল (সাঃ)-এর আদর্শে ঐ ব্যক্তি আদর্শবান হবে, যে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী এবং যে বেশি বেশি আল্লাহকে স্মরণ করে থাকে।

বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান উক্ত দুই গুণ থেকে বঞ্চিত। যার ফলে তাদের অন্তরে রসূল (সাঃ)-এর আদর্শের কোন গুরুত্ব নেই। এদের মধ্যে যারা দ্বীনদার তাদের আদর্শ হল পীর ও বুযুর্গরা। আর যারা দুনিয়াদার বা রাজনৈতিক তাদের আদর্শ ও পথপ্রদর্শক হল পাশ্চাত্যের নেতারা। রসূল (সাঃ)-এর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার কথা এরা মুখে খুব দাবী করে, কিন্তু কার্যতঃ তাঁকে নিজেদের আদর্শ, নেতা ও পথপ্রদর্শক মানার ব্যাপারে অধিকাংশই পিছনে। সুতরাং এ বিচার আল্লাহই করবেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরিত্র, আমাদের জন্য তাঁর গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর নাতী হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের সাথে আচরণ সম্পর্কে আমার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলাম: উত্তরে তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাস্যোজ্জল চেহারাসম্পন্ন, অমায়িক চরিত্রের অধিকারী ও বিনয়ী ছিলেন। কঠোর ছিলেন না, হৈচৈ-কারী ছিলেন না, ছিদ্রান্বেষী ও কৃপণ ছিলেন না, তাঁর নিকট আগত ব্যক্তি নিরাশ ও হতাশ হত না। তিনি নিজের মধ্য হতে তিনটি জিনিস পরিত্যাগ করেছিলেন: [১] রিয়া বা আত্মপ্রকাশ [২]

অতিরঞ্জন এবং [৩] অনর্থক কার্যকলাপ। মানুষের জন্য তিনি তিনটি জিনিসকে পরিত্যাগ করেন: [১] তিনি কাউকে নিন্দা করতেন না [২] কাউকে দোষারোপও করতেন না [৩] সওয়াবের প্রত্যাশা ব্যতীত কোন কথাই বলতেন না। যখন তিনি কথা বলতেন, শ্রবণকারীরা এমনভাবে কান পেতে শুনত যেন তাদের মাথায় পাখী বসে আছে। অত:পর যখন তিনি কথা শেষ করতেন তখন তারা কথা বলত। তারা তাঁর সামনে কখনো ঝগড়া বা কথা কাটাকাটি করত না। তাঁর নিকট কেউ কথা বলা আরম্ভ করলে তারা তার কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকত। তাঁর উপস্থিতিতে তাদেরই কথা বলার অধিকার থাকত যারা প্রথম কথা বলা শুরু করত। লোকেরা যাতে হাসে তিনিও তাতে হাসতেন, মানুষ যাতে আশ্চর্য হয় তিনিও তাতে আশ্চর্য হতেন এবং তিনি বলতেন: "যখন তোমরা কোন অভাবীকে তার প্রয়োজনীয় কিছু প্রার্থনা করতে দেখ তার প্রার্থনায় তাকে সাহায্য করো।" তিনি মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা পছন্দ করতেন না, কারো কথা বলার সময় তার কথার মাঝে বাধা দিতেন না, হ্যাঁ, তবে সীমা অতিক্রম করলে তাকে হয়ত আদেশ বা নিষেধ করতেন। তিরমিযী

وَ لَمَّا رَاَ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ الۡاَحۡزَابَ ۙ قَالُوۡا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُوۡلُهٗ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُوۡلُهٗ ۫ وَ مَا زَادَهُمۡ اِلَّاۤ اِیۡمَانًا وَّ تَسۡلِیۡمًا ২২ : ৩৩

২২. আর মুমিনগণ যখন সম্মিলিত বাহিনীকে দেখল, তারা বলে উঠল, এটা তো তাই, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যার প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন। আর এতে তাদের ঈমান ও আনুগত্যই বৃদ্ধি পেল।

মুনাফিকরা শত্রুদের বেশি সৈন্য এবং মুসলিমদের সঙ্গিন অবস্থা দেখে বলেছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওয়াদা ধোঁকাবাজি ছিল। আর এর বিপরীত মু' মিনগণ বলেছিলেন যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ) যে ওয়াদা করেছেন যে, পরখ ও পরীক্ষার পরে তোমাদেরকে সাহায্য ও বিজয় দান করা হবে --তা সত্য।

এ প্রসঙ্গে ১২নং আয়াতটি দৃষ্টিসমক্ষে রাখা উচিত। সেখানে বলা হয়েছিল, যারা ছিল মুনাফিক ও হৃদয়ের রোগে আক্রান্ত, তারা দশ বারো হাজার সৈন্যকে সামনে থেকে এবং বনী কুরাইযাকে পিছন থেকে আক্রমণ করতে দেখে চিৎকার করে বলতে থাকে, "আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ আমাদের সাথে যেসব অঙ্গীকার করেছিলেন সেগুলো ডাহা মিথ্যা ও প্রতারণা প্রমাণিত হলো। আমাদের বলা তো হয়েছিল, আল্লাহর দ্বীনের প্রতি ঈমান আনলে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন পেছনে থাকবে, আরবে ও আজমে তোমাদের ডংকা বাজবে এবং রোম ও ইরানের সম্পদ তোমাদের করায়ত্ত হবে কিন্তু এখন দেখছি সমগ্র আরব আমাদের খতম করে দেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এবং আমাদেরকে এ বিপদ সাগর থেকে উদ্ধার করার জন্য কোথাও ফেরেশতাদের

সৈন্যদলের টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না।" এখন বলা হচ্ছে ঐ সব মিথ্যা ঈমানের দাবীদার আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অঙ্গীকারের যে অর্থ বুঝেছিল এর একটি তাই ছিল। সাচ্চা ঈমানদাররা এর যে অর্থ বুঝেছে সেটি এর দ্বিতীয় অর্থ।

বিপদের ঘনঘটা দেখে আল্লাহর অঙ্গীকারের কথা তাদেরও মনে পড়েছে কিন্তু এ অঙ্গীকার নয় যে, ঈমান আনার সাথে সাথেই কুটোটিও নাড়ার দরকার হবে না সোজা তোমরা দুনিয়ার শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে যাবে এবং ফেরেশতারা এসে তোমাদের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দেবে। বরং এ অঙ্গীকার যে, কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে তোমাদের এগিয়ে যেতে হবে, বিপদের পাহাড় তোমাদের মাথায় ভেঙ্গে পড়বে, তোমাদের চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে, তবেই কোন পর্যায়ে আল্লাহর অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি বর্ষিত হবে এবং তোমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতের এমন সব সাফল্য দান করা হবে যেগুলো দেবার অঙ্গীকার আল্লাহ মু' মিন বান্দাদের সাথে করেছিলেনঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ

"তোমরা কি একথা মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা জান্নাতে এমনিই প্রবেশ করে যাবে? অথচ তোমাদের পূর্বে যারা ঈমান এনেছিল তারা যে অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল এখনো তোমরা সে অবস্থার সম্মুখীন হওনি। তারা কাঠিন্য ও বিপদের মুখোমুখি হয়েছিল এবং তাদেরকে নাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল, এমনকি রসূল ও তার সঙ্গী-সাথীরা চিৎকার করে উঠেছিল আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে!-শোনো, আল্লাহর সাহায্য নিকটেই আছে।" (আল বাকারাহ্ ২১৪)

أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ - وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

"লোকেরা কি একথা মনে করে নিয়েছে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে আর পরীক্ষা করা হবে না? অথচ এদের আগে যারা অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের সবাইকে আমি পরীক্ষা করেছি। আল্লাহকে অবশ্যই দেখতে হবে কে সত্যবাদী এবং কে মিথ্যাবাদী" (আল আনকাবূত, ২-৩)

অর্থাৎ, কঠিন অবস্থা ও ভীষণ পরিস্থিতি তাদের ঈমানকে বিচলিত করতে পারেনি, বরং তাদের ঈমানে আনুগত্যের স্পৃহা, অনুবর্তিতা ও সন্তোষ আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয় যে, মানুষের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ঈমান ও ঈমানী শক্তিতে কম ও বেশি হয়ে থাকে; যেমন মুহাদ্দিসগণ এ কথা বলেন।

বিপদ আপদের এ পাহাড় দেখে তাদের ঈমান নড়ে যাবার পরিবর্তে আরো বেশি বেড়ে গেলো এবং আল্লাহর হুকুম পালন করা থেকে দূরে পালিয়ে যাবার পরিবর্তে তারা আরো বেশী প্রত্যয় ও নিশ্চিন্ততা সহকারে সবকিছু তাঁর হাতে সোপর্দ করতে উদ্যোগী হয়ে উঠলো।

এ প্রসঙ্গে একথা ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে যে, ঈমান ও আত্মসমর্পণ আসলে মনের এমন একটি অবস্থা যা দ্বীনের প্রত্যেকটি হুকুম ও দাবীর মুখে পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। দুনিয়ার জীবনে প্রতি পদে পদে মানুষ এমন অবস্থার মুখোমুখি হয় যখন দ্বীন কোন কাজের আদেশ দেয় অথবা তা করতে নিষেধ করে অথবা প্রাণ, ধন-সম্পদ, সময়, শ্রম ও প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ত্যাগ করার দাবী করে। এ ধরনের প্রত্যেক সময়ে যে ব্যক্তি আনুগত্য থেকে সরে আসবে তার ঈমান ও আত্মসমর্পণ কমতি দেখা দেবে এবং যে ব্যক্তিই আদেশের সামনে মাথা নত করে দেবে তার ঈমান ও আত্মসমর্পণ বেড়ে যাবে যদিও শুরুতে মানুষ কেবলমাত্র ইসলাম গ্রহণ করতেই মু’ মিন ও মুসলিম রূপে গণ্য হয়ে যায় কিন্তু এটা কোন স্থির ও স্থবির অবস্থা নয়।

এ অবস্থা কেবল এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না। বরং এর মধ্যে উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে। আনুগত্য ও আন্তরিকতার অভাব ও স্বল্পতা এর অবনতির কারণ হয়। এমনকি এক ব্যক্তি পেছনে হটতে হটতে ঈমানের শেষ সীমানায় পৌঁছে যায়, যেখান থেকে চুল পরিমাণ পেছনে হটলেই সে মু’ মিনের পরিবর্তে মুনাফিক হয়ে যায়।

পক্ষান্তরে আন্তরিকতা যত বেশী হতে থাকে, আনুগত্য যত পূর্ণতা লাভ করে এবং আল্লাহর সত্য দ্বীনের ঝাণ্ডা বুলন্দ করার ফিকির, আকাঙ্ক্ষা ও আত্মনিমগ্নতা যত বেড়ে যেতে থাকে সেই অনুপাতে ঈমানও বেড়ে যেতে থাকে। এভাবে এক সময় মানুষ ‘সিদ্দীক’ তথা পূর্ণ সত্যবাদীর মর্যাদায় উন্নীত হয়। কিন্তু এই তারতম্য ও হ্রাসবৃদ্ধি কেবল নৈতিক মর্যাদার মধ্যেই সীমিত থাকে। আল্লাহ ছাড়া আর কারো পক্ষে এর হিসেব করা সম্ভব নয়। বান্দাদের জন্য একটি স্বীকারোক্তি ও সত্যতার ঘোষণাই ঈমান। এর মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান ইসলামে প্রবেশ করে এবং যতদিন সে এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে ততদিন তাকে মুসলমান বলে মেনে নেয়া হয়। তার সম্পর্কে আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, সে আধা মুসলমান বা সিকি মুসলমান কিংবা দ্বিগুন মুসলমান বা ত্রিগুন মুসলমান। এ ধরনের আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে সকল মুসলমান সমান। কাউকে আমরা বেশী মু’ মিন বলতে পারি না এবং তার অধিকারও বেশী হতে পারে না। আবার কাউকে কম মু’ মিন গণ্য করে তার অধিকার কম করতে পারি না। এসব দিক দিয়ে ঈমান কম-বেশী হওয়ার কোন প্রশ্ন দেখা দেয় না। আসলে এ অর্থেই ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেনঃ الايمان لايزيد ولاينقص

অর্থাৎ “ঈমান কম-বেশী হয় না”

مِنَ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ رِجَالٌ صَدَقُوۡا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَیۡهِ ۚ فَمِنۡهُمۡ مَّنۡ قَضٰی نَحۡبَهٗ وَ مِنۡهُمۡ ৩৩ : ২৩
مَّنۡ یَّنۡتَظِرُ ۫ۖ وَ مَا بَدَّلُوۡا تَبۡدِیۡلًا ﴿۲۳﴾

২৩. মুমিনদের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর সাথে তাদের করা অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, তাদের কেউ কেউ (অঙ্গীকার পূর্ণ করে) মারা গেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় রয়েছে। তারা তাদের অঙ্গীকারে কোন পরিবর্তন করেনি;

এই আয়াত ঐ সকল সাহাবায়ে-কিরামগণ (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে, যাঁরা এই সময়ে নিজ নিজ জীবন কুরবানী দেওয়ার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে ঐ সকল সাহাবা (রাঃ)গণও ছিলেন, যাঁরা বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি; কিন্তু তাঁরা এই অঙ্গীকার করে রেখেছিলেন যে, আগামীতে কোন যুদ্ধ উপস্থিত হলে তাতে পূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করবেন। যেমন আনাস বিন নাযর (রাঃ) এবং আরো অনেকে যাঁরা উহুদ যুদ্ধে লড়তে লড়তে শহীদ হয়ে যান। উক্ত আনাসের দেহে তরবারি, ফলা ও তীরের আঘাত জনিত আশির অধিক যখম ছিল। শাহাদত বরণ করার পর তাঁর বোন তাঁকে তাঁর আঙ্গুলের ডগা দেখে চিনেছিলেন। (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ ৪/১৯৩)

এ আয়াতে উল্লেখিত (قَضَىٰ نَحْبَهُ) এর তাফসীরে কয়েকটি মত এসেছে,

এক. আল্লাহর সাথে কৃত তাদের মানত পূর্ণ করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে।

দুই. আল্লাহর সাথে যে অঙ্গীকার তারা করেছে তারা তা পূর্ণ করা অবস্থায় তাদের মৃত্যু হয়েছে। তারা এ অঙ্গীকারের ক্ষেত্রে কোন অন্যথা করেনি।

তিন. তাদের মধ্যে কেউ কেউ মারা গেছে। এ আয়াতে সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসা করা হয়েছে। আন্যাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমার চাচা আনাস, যার নাম আমার নাম। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এটা তাকে পীড়া দিচ্ছিল। তিনি বলছিলেন যে, প্রথম যুদ্ধেই আমি রাসূলের সাথে থাকতে পারিনি। যদি আল্লাহ আমাকে এর পরবর্তী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয় তাহলে আল্লাহ দেখবেন আমি কি করি। তারপর তিনি রাসূলের সাথে ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেন। যুদ্ধের ময়দানে সা'দ ইবনে মু'আজকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু আমর! কোথায়? তিনি জবাবে বললেন, আমি ওহুদের দিকে জান্নাতের সুগন্ধ পাচ্ছি। তারপর আনাস ইবনে নাদর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রচণ্ডরকম যুদ্ধ করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। এমনকি তার গায়ে আশিটিরও বেশী আঘাত পরিলক্ষিত হয়েছিল। তার জন্যই এ আয়াত নাযিল হয়েছিল। [বুখারী: ৪৭৮৩]

لِّيَجۡزِيَ اللّٰهُ الصّٰدِقِيۡنَ بِصِدۡقِهِمۡ وَ يُعَذِّبَ الۡمُنٰفِقِيۡنَ اِنۡ شَآءَ اَوۡ يَتُوۡبَ عَلَيۡهِمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوۡرًا رَّحِيۡمًا ৩৩ : ২৪

২৪. যাতে আল্লাহ্ পুরস্কৃত করেন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতার জন্য এবং শাস্তি দেন মুনাফিকদেরকে যদি তিনি চান অথবা তাদেরকে ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

وَ رَدَّ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِغَيۡظِهِمۡ لَمۡ يَنَالُوۡا خَيۡرًا ؕ وَ كَفَى اللّٰهُ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ الۡقِتَالَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيۡزًا ৩৩ : ২৫

২৫. আর আল্লাহ কাফিরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন, তারা কোন কল্যাণ লাভ করেনি। আর যুদ্ধে মুমিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; এবং আল্লাহ সর্বশক্তিমান, প্রবল পরাক্রমশালী।

মুশরিকরা যারা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একত্রিত হয়ে মুসলিমদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেওয়ার জন্য এসেছিল, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তাদের ক্রোধ ও বিফলতা সহ ফিরিয়ে দিলেন। না পার্থিব কোন সম্পদ তাদের হাতে এল, আর না আখেরাতে তারা সওয়াব ও নেকীর অধিকারী হবে। তাদের কোন ধরনের লাভ অর্জন হল না।

অর্থাৎ, মুসলিমদেরকে তাদের সাথে লড়াই করার কোন প্রয়োজনই হল না; বরং আল্লাহ তাআলা হাওয়া ও ফিরিশতাদের মাধ্যমে নিজ মু’মিন বান্দাদের জন্য সাহায্যের হাতিয়ার প্রেরণ করলেন। এই জন্য নবী (সাঃ) বলেছেন,(لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَه، وَأَعَزَّ جُنْدَه، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَه، فَلاَ شَيءَ بَعْدَه) অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা’বূদ নেই, তিনি একক, তিনি স্বীয় অঙ্গীকার পূরণ করেছেন, স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন, স্বীয় বাহিনীকে জয়যুক্ত করেছেন এবং সকল (শত্রু)বাহিনীকে তিনি একাই পরাজিত করেছেন। তাঁর পর কিছু নেই। (বুখারী, মুসলিম) উক্ত দু’আটি হজ্জ-উমরাহ, জিহাদ এবং সফর থেকে ফিরে আসার সময় পড়া বিধেয়।

وَ اَنۡزَلَ الَّذِيۡنَ ظَاهَرُوۡهُمۡ مِّنۡ اَهۡلِ الۡكِتٰبِ مِنۡ صَيَاصِيۡهِمۡ وَ قَذَفَ فِيۡ قُلُوۡبِهِمُ الرُّعۡبَ فَرِيۡقًا تَقۡتُلُوۡنَ وَ تَاۡسِرُوۡنَ فَرِيۡقًا ৩৩ : ২৬

২৬. আর কিতাবীদের মধ্যে যারা তাদেরকে সাহায্য করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দূর্গ হতে অবতরণ করালেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; তোমরা তাদের কিছু সংখ্যককে হত্যা করছ এবং কিছু সংখ্যককে করছ বন্দী।

এই আয়াতে মূলত ঐতিহাসিক খন্দকের যুদ্ধ (Battle of the Trench) এবং পরবর্তীতে বনু কুরাইজা নামক ইহুদি গোত্রের বিশ্বাসঘাতকতা ও তাদের দুর্গের পতনের ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তারা মুসলমানদের সাথে চুক্তি ভঙ্গ করে মক্কার কুরাইশ ও অন্যান্য কাফির বাহিনীকে সাহায্য করেছিল।

এখানে বনু-কুরাইযার ঘটনা বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে, যে সকল আহলে কিতাব সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর সহযোগিতা করেছে, আল্লাহ্ তা' আলা তাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভীতি সঞ্চার করে তাদেরকে তাদের সুরক্ষিত দুর্গ থেকে নীচে নামিয়ে দেন এবং তাদের ধন-সম্পদ ও ঘর-বাড়ি মুসলিমগণের স্বত্বভুক্ত করে দেন। [দেখুন: মুয়াস্‌সার]

বনু কুরাইজার যুদ্ধ (Battle of Banu Qurayza) ইসলামের ইতিহাসের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল অধ্যায়। এটি হিজরি ৫ম সনে (৬২৭ খ্রিস্টাব্দে) খন্দকের যুদ্ধের (Battle of the Trench) ঠিক পরপরই সংঘটিত হয়েছিল।এই যুদ্ধের মূল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. মদিনার সনদ ও পারস্পরিক চুক্তিরাসূলুল্লাহ (সা.) মদিনায় হিজরত করার পর মুসলিম, অমুসলিম এবং মদিনার ইহুদি গোত্রগুলোর মধ্যে একটি ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেন, যা মদিনার সনদ নামে পরিচিত। মদিনার অন্যতম প্রধান ইহুদি গোত্র বনু কুরাইজা এই চুক্তির অংশ ছিল। চুক্তির মূল শর্ত ছিল—বাইরের কোনো শত্রু যদি মদিনা আক্রমণ করে, তবে সব পক্ষ মিলে যৌথভাবে মদিনাকে রক্ষা করবে এবং কেউ শত্রুপক্ষকে কোনো ধরনের সাহায্য করতে পারবে না।

২. খন্দকের যুদ্ধ এবং বনু কুরাইজার বিশ্বাসঘাতকতাহিজরি ৫ম সনে মক্কার কুরাইশরা আরবের অন্যান্য গোত্রগুলোকে সাথে নিয়ে প্রায় ১০,০০০ সৈন্যের একটি বিশাল সম্মিলিত বাহিনী গঠন করে মদিনা আক্রমণ করে। ইসলামের ইতিহাসে এটি 'খন্দকের যুদ্ধ' বা 'আহযাবের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। মুসলমানদের সুরক্ষার জন্য মদিনার চারপাশে পরিখা বা খন্দক খনন করা হয়েছিল।যুদ্ধ যখন চরম উত্তেজনাকর অবস্থায়, তখন মদিনার ভেতর থেকে আরেকটি ইহুদি গোত্র (বনু নাযির)-এর নেতা হুয়াই ইবনে আখতাব বনু কুরাইজার প্রধান কাব ইবনে আসাদকে প্ররোচিত করে। সম্মিলিত কাফির বাহিনীর বিশালতা দেখে বনু কুরাইজা ভেবেছিল এবার মুসলমানদের পতন নিশ্চিত। ফলে তারা মুসলমানদের সাথে কৃত মদিনার সনদ ভঙ্গ করে এবং গোপনে মক্কার কুরাইশ বাহিনীর সাথে হাত মেলায়। তারা মদিনার ভেতর থেকে মুসলিম নারী ও শিশুদের ওপর

আক্রমণের পরিকল্পনা করে, যা খন্দকের যুদ্ধে অবরুদ্ধ মুসলমানদের জন্য চরম মানসিক ও কৌশলগত বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

খন্দকের যুদ্ধ শেষ করে মুসলিম বাহিনী যখন অস্ত্র নামিয়ে রেখেছিলেন, ঠিক তখনই জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে আসেন যে, চুক্তিভঙ্গকারী ও বিশ্বাসঘাতক বনু কুরাইজার চূড়ান্ত ফয়সালা এখনো বাকি।রাসূলুল্লাহ (সা.) অবিলম্বে সাহাবিদের নির্দেশ দেন বনু কুরাইজার দুর্গ অভিমুখে রওনা হতে। মুসলিম বাহিনী তাদের দুর্গ প্রায় ২৫ দিন যাবৎ অবরুদ্ধ করে রাখে। অবশেষে নিরুপায় হয়ে বনু কুরাইজা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেয়।

বনু কুরাইজার ইহুদিরা আওস গোত্রের সাথে তাদের পুরনো মিত্রতার খাতিরে অনুরোধ করে যেন তাদের বিচারের দায়িত্ব আওস গোত্রের প্রধান সা'দ ইবনে মুআয (রা.)-এর ওপর দেওয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাদের এই অনুরোধ মেনে নেন।সা'দ ইবনে মুআয (রা.) খন্দকের যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। তাকে আনা হলে তিনি ইহুদিদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ তওরাতের বিধান অনুযায়ী (Deuteronomy 20:10-14) ফয়সালা দেন যে:বনু কুরাইজার যুদ্ধাপরাধী পুরুষদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।নারী ও শিশুদের বন্দি করা হবে।তাদের সমস্ত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হবে।এই ফয়সালা অনুযায়ীই বনু কুরাইজার বিচার কার্যকর করা হয়েছিল, যা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-আহযাবের ২৬ নম্বর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

বনু কুরাইজার ঘটনার পর মদিনার রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসে, যা মুসলিম উম্মাহর ভিত্তি সুদৃঢ় করে এবং মদিনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। প্রধান পরিবর্তনগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১. ইহুদি শক্তির অবসান ও একক মুসলিম কর্তৃত্বঃ

হিজরতের পর মদিনায় তিনটি প্রধান ইহুদি গোত্র ছিল—বনু কাইনুকা, বনু নাযির এবং বনু কুরাইজা। পূর্ববর্তী দুটি গোত্র চুক্তিভঙ্গ ও ষড়যন্ত্রের কারণে আগেই মদিনা থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিল। বনু কুরাইজার পতনের মাধ্যমে মদিনার অভ্যন্তর থেকে ইহুদিদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। ফলে মদিনা রাষ্ট্রে মুসলমানদের একক ও নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও মুনাফিকদের দুর্বলতা

এতদিন মদিনার ভেতরে থাকা মুনাফিকরা (কপট বিশ্বাসী) এবং ইহুদিরা মিলে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করত। বনু কুরাইজার কঠোর পরিণতির পর মদিনার অবশিষ্টাংশ মুনাফিকরা চরম আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে যে, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের

দেশদ্রোহিতা বা ষড়যন্ত্রের পরিণতি হবে ভয়াবহ। ফলে মদিনার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

৩. গোত্রীয় মিত্রতার চেয়ে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের প্রাধান্যঃ আরবের চিরন্তন নিয়ম ছিল যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজের মিত্র গোত্রকে অন্ধভাবে সমর্থন করা। কিন্তু বনু কুরাইজার বিচারে আউস গোত্রের প্রধান সা'দ ইবনে মুআয (রা.) গোত্রীয় প্রীতির ঊর্ধ্বে উঠে মদিনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও ইনসাফকে প্রাধান্য দেন। এর ফলে মদিনার সমাজ ব্যবস্থা থেকে জাহেলিয়াতের গোত্রপ্রীতি দূর হয় এবং ইসলামের আদর্শভিত্তিক সামাজিক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব শক্তিশালী হয়।

৪. কুরাইশদের মনস্তাত্ত্বিক পরাজয় ও মদিনার মর্যাদা বৃদ্ধিঃ মক্কার কুরাইশরা আরবের সমস্ত গোত্রকে একত্রিত করেও মদিনা রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হয়েছিল। উপরন্তু, মদিনার ভেতরে তাদের সবচেয়ে বড় সহযোগী বনু কুরাইজার পতন কুরাইশদের জন্য ছিল এক বিশাল মনস্তাত্ত্বিক ধাক্কা। এর ফলে সমগ্র আরবে মদিনা রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক মর্যাদা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছায় এবং আশেপাশের বেদুইন গোত্রগুলো মুসলমানদের সমীহ করতে শুরু করে।

৫. অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাঃ বনু কুরাইজার বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ, জমি এবং দুর্গগুলো মদিনার মুসলিম সমাজের অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করে। বিশেষ করে মক্কা থেকে আসা দরিদ্র মুহাজিরদের পুনর্বাসন এবং মুসলিম বাহিনীর সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে এই সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।সংক্ষেপে, এই ঘটনাটি মদিনাকে একটি দুর্বল ও ঝুঁকিপূর্ণ শহর থেকে আরবের সবচেয়ে নিরাপদ, স্থিতিশীল এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।

وَ اَوۡرَثَکُمۡ اَرۡضَہُمۡ وَ دِیَارَہُمۡ وَ اَمۡوَالَہُمۡ وَ اَرۡضًا لَّمۡ تَطَـُٔوۡہَا ؕ وَ کَانَ اللّٰہُ عَلٰی کُلِّ شَیۡءٍ قَدِیۡرًا ৩৩ : ২৭

২৭. আর তিনি তোমাদেরকে অধিকারী করলেন তাদের ভূমি, ঘরবাড়ী ও ধন-সম্পদের এবং এমন ভূমির যাতে তোমরা এখনো পদার্পন করনি। আর আল্লাহ্ সবকিছুর উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান।

এখানে বানী কুরাইযা যুদ্ধের কথা বলা হয়েছে। যেমন পূর্বে বর্ণনা হয়েছে যে, এই গোত্র নিজেদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আহযাব যুদ্ধে মুশরিক এবং অন্য ইয়াহুদীদের সাথে মিলিত হয়েছিল। সুতরাং আহযাব যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) সবেমাত্র গোসল সেরেছেন এমতাবস্থায় জিবরীল (আঃ) এসে বললেন, আপনি হাতিয়ার রেখে দিয়েছেন? আমরা (ফিরিশতাদল) তো এখনো হাতিয়ার রাখিনি। চলুন, এখন বানু কুরাইযার হিসাব চুকাতে হবে। আমাকে আল্লাহ তাআলা এই জন্য আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।

সুতরাং মহানবী (সাঃ) মুসলিমদের মাঝে বিশেষ বিজ্ঞপ্তি জারী করলেন যে, আসরের নামায ঐখানে গিয়ে পড়বে। তাদের বাসস্থান মদীনা হতে কয়েক মাইল দূরে ছিল। তারা আপন কেল্লাতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। বাইরে থেকে মুসলিমগণ তাদেরকে ঘিরে ফেলল। এই অবরোধ প্রায় বিশ-পঁচিশ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকল। পরিশেষে তারা সা' দ বিন মুআযকে নিজেদের বিষয়ে সালিস মেনে নিল যে, তিনি আমাদের ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবেন, আমরা তা মেনে নেব। সুতরাং তিনি ফায়সালা দিলেন যে, তাদের মধ্যে যোদ্ধাদেরকে হত্যা এবং নারী ও শিশুদেরকে বন্দী করা হবে। আর তাদের সম্পদ মুসলিমদের মাঝে বন্টন করে দেওয়া হবে। নবী (সাঃ) উক্ত ফায়সালা শুনে বললেন, ''আকাশের উপর আল্লাহ তাআলার ফায়সালাও এটাই। এই ফায়সালা অনুযায়ী তাদের যোদ্ধাদের শিরশ্ছেদ করা হল এবং মদীনাকে তাদের অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করা হল। (দেখুনঃ সহীহ বুখারী, খন্দক যুদ্ধ) أَنزَلَ অর্থাৎ কেল্লা থেকে নিচে নামিয়ে দিল। ظاهروهم অর্থাৎ তারা কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করেছিল।

অনেকে বলেছেন, এ স্থান থেকে উদ্দেশ্য হল খায়বার এলাকা। আহযাবের পরেই ৬ হিজরী সনে হুদাইবিয়ার সন্ধির পর মুসলিমরা খায়বার জয় করেন। অনেকে বলেছেন, মক্কা। অনেকে রোম বা পারস্যের এলাকা উদ্দেশ্য বলেছেন। পক্ষান্তরে অনেকের নিকট আয়াতের উদ্দেশ্য হল, ঐ সকল দেশ ও এলাকা যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিমগণ জয়লাভ করবেন। (ফাতহুল ক্বাদীর)